হীরক রায়

ডোঙ্গরগড়ের ভয়ঙ্কর মানুষ

ডোঙ্গরগড়ের ভয়ঙ্কর মানুষ

ডোঙ্গরগড়ের ভয়ঙ্কর মানুষ

হীরক রায়

অনন্য প্রকাশন — ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

রিনকু টুম্পা, শম্পা
কুমকুম ও টুবলিংকে

নিবেদন

ডোঙ্গর গড়ে গিয়েছিলাম বেড়াতে। সেখানে পাহাড়ের মাথায় একটা মন্দির আছে। লোকমুখে শোনা যায়, ঐ মন্দিরটা রাজা বিক্রমাদিত্য তৈরী করেছিলেন। এই পর্যন্ত সবই ঠিক, কাহিনীর বাকি সবটাই কল্পনা। ডোঙ্গরগড়ের শান্ত নির্জন পরিবেশে এমন ঘটনা ঘটলে তা নিঃসন্দেহে হবে গভীর পরিতাপের বিষয়। ডোঙ্গরগড়ের শান্ত নির্জন মন্দিরে প্রতি বছর অজস্র মানুষ ভারতের নানা প্রান্ত থেকে আসেন এবং সেখানকার পরিবেশ আমার মনকেও এত আকর্ষণ করেছিল যে এই কাহিনী লেখার সময় কলমের অক্ষরে যে নামটি নিজের অজ্ঞাতেই লিখে ফেললাম, তা হোল—ডোঙ্গরগড়।

সুমন বলল, একদম শব্দ করবি না। চুপ করে থাকবি। যা করার আমি করবো।

ঠিক তখুনি পাশের বাঁশঝাড়ে একটা শব্দ উঠল। বিল্টু ফিসফিস করে বলল, বাঁশঝাড়ে সাপ থাকে। মা বলেছিল কেউটেও থাকে। আমি কিন্তু তবুও ভয় পাচ্ছি না।

সুমন চাপা গলায় ধমকে উঠল, তোকে বললাম না চুপ করে থাকতে। ফের বকবক করছিস। ঐ দেখ, ডোঙ্গরগড় পাহাড়ের থেকে আলোটা কাঁপতে কাঁপতে নামছে। এখন শুধু দেখে যা মুখ বন্ধ করে।

ডোঙ্গরগড়ে সুমন আর বিল্টু পেঁছেছিল হাবুলকাকুর সঙ্গে। হাবুলকাকু ফরেস্ট অফিসার। বন বাদাড়ের চমৎকার সব গল্প বলতে পারেন। ওঁর সাহসও খুব। উনি নাকি পায়ের ছাপ দেখে বলে দিতে পারেন, ওটা বাঘের কি শেয়ালের পায়ের ছাপ। একবার নাকি একটা বাঘের লেজ এত জোরে মুচড়ে দিয়েছিলেন যে সেই বাঘ মুলুক ছেড়ে পালিয়েছিল। গরমের ছুটিতে হাবুলকাকু সুমন আর বিল্টুকে নিয়ে এসেছেন ডোঙ্গরগড় পাহাড় আর জঙ্গল দেখাবেন বলে। কিন্তু এমনই কপাল—আসতে না আসতেই হাবুলকাকুকে সাতদিনের জন্য ছুটতে হয়েছে দন্ডকারণ্যে একটা বিশেষ

কাজে। যাবার আগে বারবার বলে গেছেন, সন্ধ্যের পর একদম বাইরে যাবি না। এখানে অবিশ্যি কোন ভয় নেই। তবু বলা তো যায় না, বিপদ ওৎ পেতে বসে থাকতে পারে যেখানে সেখানে।

ডোঙ্গরগড় জায়গাটা বিল্টু সুমনের খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। ভোরবেলা এখানে কত যে পাখি ডাকে, আর কি সুন্দর তাদের গলার স্বর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওরা অনেকক্ষণ ধরে এই ডাক শোনে। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে, দূরের মন্দিরে ঘন্টা বাজে, পাহাড়ের গায়ে যে মন্দির তার পুরোহিত মশায় চান করতে যান নদীতে। 'হরি ওঁ তৎ সৎ' শুনলেই বোঝা যায় পুরোহিতমশাই যাচ্ছেন।

ডোঙ্গরগড় পাহাড়ের দিকে তাকালে মনে হয় সেটা খুব কাছেই আছে। যত এগিয়ে যাওয়া যায় পাহাড় ততই সরে সরে যায়। আসলে সব পাহাড়ই এমন—হাবুলকাকা বলেছিলেন সুমন আর বিল্টুকে। পাহাড় দেখতে খুব বড়, তাই অনেকদূরে থেকে দেখা যায়। মনে হয় কাছেই আছে। কিন্তু হাঁটতে শুরু করলে বোঝা যায় পাহাড় কত দূরে। অনেকে একে বলে পাহাড়ের মায়া।

ডোঙ্গরগড় পাহাড়ে যখন মেঘের ছায়া পড়ে তখন কেমন হালকা নীলরঙের হয়ে যায় পাহাড়ের গা। সুমন আর

বিল্টুর মনে হয়, গাছগাছালিতে ভরা ওই পাহাড়ে হাজার মজা আছে ছড়িয়ে। যেতে ইচ্ছে করে তবু যাওয়া হয় না। হাবুলকাকু বারবার মানা করে গেছেন যে।

বিকাল বেলা নদীর চরে বেড়াতে বেড়াতে সুমন বলল, বিল্টু, চল, কাল সকালে আমরা পাহাড়ে যাবো।

বিল্টু চমকে উঠল। পাহাড়ে? কেন? হাবুলকাকা মানা করে গেছেন না!

সুমন বলল, পাহাড়ের মাথায় মন্দির আছে। মন্দিরে ঘন্টা বাজে, ওখানে গেলে কোন ক্ষতি হবে না। আজ চল। আমরা পাহাড়ের রাস্তাটা চিনে আসবো। কাল সকালে যাবো।

বিল্টু একবার আকাশের দিকে তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, আজই যাবি? আর একটু ভেবে দেখলে হোত না। তাছাড়া সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সন্ধ্যে হতেও বেশী দেরী নেই।

সুমন বিল্টুর চোখে চোখ রেখে বলল, হ্যাঁ, আজই যাবো। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলল, চল, আমার সঙ্গে।

ডোঙ্গরগড়ে এই আঁকাবাঁকা নদীটা সূর্যাস্তের সময়

আকাশের ছায়ায় লাল হয়ে যায়। দু'চারজন তখন স্নান করে, কাপড় কাচে। পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে বাসায় ফেরে। কোন্ গাছের ফোঁকর থেকে তক্ষক ডেকে উঠল। একটা কাল বেড়াল দৌড়ে গেল। রাস্তার বাঁকে পেঁাছে ওরা চিন্তায় পড়ল। দুটো রাস্তা। একটা বাঁদিকে একটা ডানদিকে। দুটোই গোল হয়ে ঘুরে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। কোন্ রাস্তা ধরে চলবে—সুমন এক লহমা ভাবল।

বিল্টু বলল, এবার বোঝ! দুটো রাস্তা। দুটোই অচেনা! কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ব। তার চেয়ে বলি কি ফিরে চল।

সুমন বিল্টুর কথায় কান না দিয়ে বলল, ব্যস, মুস্কিল আসান। পাহাড়ের মন্দিরে কে আলো জ্বালিয়েছে। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ডান দিকের পথটাই পাহাড়ের রাস্তা। কাল এখান দিয়েই যাবো।

ফেরার পথে কয়েক পা হাঁটতেই ওরা দেখতে পেল, দূর থেকে একজন ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটা ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় বিল্টুর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সুমনও থমকে দাঁড়াল। লোকটার একগাল দাড়ি। রোগা, লম্বা, ভয়ঙ্কর একজোড়া চোখ। লোকটা প্রায় ছুটতে ছুটতে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। নিমেষে বাঁকের

আড়ালে মিলিয়ে গেল।

সুমন বলল, লোকটা কে হতে পারে? এমন সময় পাহাড়ের দিকে ছুটলই বা কেন?

বিল্টু বলল, লোকটার চেহারা দেখেছিস! কি সাংঘাতিক চোখ! ও কিছুতেই ভাল লোক হতে পারে না।

সুমন বলল, না। কথাটা তা নয়। লোকটা আমাদের দেখে পালালো—নাকি পাহাড়ে ওর কোন কাজ আছে। যদি আমাদের দেখে পালায়, তবে কেন পালালো। শোন বিল্টু, কাল বিকেলে আমরা আবার আসবো। লোকটা যদি কালও ঐদিকে যায় তাহলে ওর ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। ব্যাপারটা কি তা জানতে হবে।

বিল্টু বলল, হাবুলকাকা কাল ফিরলে বাঁচা যায়। তুই শেষকালে কি যে ঘটাবি কে জানে। লোকটা যে ভাল নয় এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। আমাদের দেখার কি দরকার—ও কে কিংবা কোথায় কি করে?

সুমন হাঁটতে হাঁটতে বলল, কাল আবার আসবো। আমাকে জানতেই হবে লোকটা কে? কেন এমন করে ছুটে পাহাড়ের দিকে যায়। শোন, আর একটা কথা! হাবুল-কাকিমাকে এসব কোন কথা একদম বলবি না। খবরদার।

পরের দিন বিকালে বেরুবার আগে বিল্টু সদর ঘরে এসে ফিসফিস করে বলল, কাকিমা কোথায় রে?

ঠিক তখুনি হাবুলকাকিমা বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকলেন। দুজনকেই বাইরে যাবার জন্য তৈরী দেখে বললেন, কি সবাই যে রেডি। নতুন জায়গা, বেশী দূরে যেয়ো না। সন্ধ্যে হতে খুব বেশী দেরী নেই। আজ তাড়াতাড়িই ফিরে এসো।

বিল্টু বলল, কাকিমা, একটা টর্চ নেবো নাকি সঙ্গে।

হাবুলকাকিমা হেসে ফেললেন। বললেন, বেশ তো, নিয়ে যাও। আর এই হান্টারটাও নাও সঙ্গে। তোমার হাবুলকাকা বিকালের দিকে বের হলে এই দুটো সব সময় সঙ্গে রেখে দেন।

সুমন বলল, কাকিমা বিল্টুটা একেবারে ভীতুর রামা। ওর খালি এই চাই সেই চাই।

হাবুলকাকিমা বিল্টুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন, না, না, তা কেন। আসলে আমাদের বিল্টুবাবু খুব সাবধানী মানুষ।

সুমন আর কথা বাড়ালো না। বলল, কাকিমা আমরা এবার আসি?

সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে হাবুলকাকিমা বললেন, এসো বাবা।

নদীর ধারে যখন ওরা পৌছল তখন নদীর তীর রোজকার মতো প্রায় নির্জন। আকাশে মেঘ ছিল। তাই

নদীর রং কালচে দেখাচ্ছিল। এমন মেঘলা দিনে পাখিরা তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরে। আজ বেশী পাখিও দেখা গেল না। ওরা আস্তে আস্তে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

রাস্তার বাঁক পার হয়ে ডানদিকের রাস্তার সামনে একটা বাঁশঝাড়। সুমন খুব মন দিয়ে চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, এখানে আমরা দাঁড়াবো। এখানে থাকলে ঐ লোকটা আমাদের দেখতে পাবে না। অথচ ওকে আমরা দেখতে পাবো।

ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে সেই লোকটা একই ভঙ্গিতে, প্রায় ছুটতে ছুটতে, ওদের পাশ দিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

বিল্টু ফিসফিস করে বলল, ঐ তো লোকটা চলে গেল।

সুমন বলল, স্‌-স্‌-স্‌। আস্তে। একদম শব্দ করবি না। চুপ করে থাকবি।

বিল্টু বলল, পায়ে মশা কামড়াচ্ছে। মশাও মারবো না?

—এখন মারতে পারিস। কিন্তু আমি যখন বলবো তখন আর মারবি না। সুমন বলল।

বিল্টু সুমনের হান্টারটায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, এতটুকু লাঠি দিয়ে ঐ লোকটার সঙ্গে পারা যাবে?

—আবার কথা বলছিস? সুমন ফুঁসে উঠল। বলছি না, এখন শুধু চোখ খোলা রাখবি আর মুখ একদম বন্ধ।

বিল্টুর সময় যেন আর কাটতে চায় না। মাথার ওপরে বাঁশের পাতায় পাতায় জোনাকি জ্বলছিল নিবছিল—বিল্টু অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। পাহাড়ের মন্দিরে বোধহয় এতক্ষণ আরতি হচ্ছিল। কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ আসছিল। ঘন্টাটা হঠাৎ থেমে গেল। বিল্টুর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, চরাচরের সব শব্দ এক নিমেষে থেমে গেছে। এখন কোথাও কোন শব্দ নেই। সেই নিঝুম অন্ধকারে বিল্টুর গা ছমছম করে উঠল। সে বলল, কিরে সুমন, আর কতক্ষণ এখানে থাকবি ?

সুমন বিল্টুর মুখে ডান হাত চাপা দিয়ে বলল, ঐ দেখ !

বিল্টু দেখল, পাহাড় থেকে একটা আলো কাঁপতে কাঁপতে নেমে আসছে। পাহাড়ের আলোটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। ওর বুকটা ধক্ করে উঠল। বুকের মধ্যে কেউ যেন হাতুড়ির ঘা ফেলছিল।

সুমন একদৃষ্টে পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল। আবার ফিসফিস করে বলল, ঐ দেখ বিল্টু, আলোটা এবার আমাদের দিকে আসছে।

আলোটা যত এগিয়ে আসছিল বিল্টুর বুকের ধুক-পুকুনিও ততই বাড়ছিল। কাছে আসার পর চেনা গেল, একজন মানুষ হেঁটে আসছে। তারই হাতে আলো। মানুষটা হাঁটতে হাঁটতে ওদের সামনে চলে এল। সুমন একটা ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে দিল। লোকটা থমকে দাঁড়াল।

কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখা গেল, লোকটা একটা সাদা কাপড়ে তার সারা গা জড়িয়ে নিয়েছে। মুখটা শুধু খোলা। ওদের সামনে দিয়ে যাবার সময়ও লোকটা এপাশ ওপাশ তাকাতে তাকাতে গেল। লোকটার চোখের দিকে চোখ পড়তেই অস্ফুট স্বরে বিল্টু বলল, কালকের সেই লোকটা।

সুমন তাড়াতাড়ি বিল্টুর মুখে হাত চাপা দিল। লোকটা কি মনে করে আবার ফিরে যেতে শুরু করল। পাহাড়ের বাঁকে সে মিলিয়ে গেল।

তারও অনেকক্ষণ পরে সুমন বলল, চল্।

বিল্টু এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, আমি বলেছিলাম না ঐ লোকটা খুব ভয়ঙকর!

সুমন বলল, সাদা কাপড়ে ওর শরীরটা অমন করে কেন ঢেকে রাখে? পাহাড় থেকে নেমে এসে আবার পাহাড়ের দিকে ফিরে গেল কেন? লোকটা কি তোর কথা শুনতে পেল? আর যদিই বা শুনতে পায় তাহলেও ওর ফিরে যাবার কি আছে?

বিল্টু হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোর এত সব জানার কি আছে? ও ওর মত থাক না!

রাস্তার পাশের ঝোপে সরসর করে একটা শব্দ হল। বিল্টু তিনবার বলল, লতা-লতা-লতা।

সুমন বলল, কি রে বিল্টু, কি বিড়বিড় করছিস?

—একটা গেল রে! এখন নাম বলা যাবে না। কারণ

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কাল বলবো। এখানে অনেক আছে। একবার ছোবল দিলে আর রক্ষে নেই।

সুমন শব্দ না করে হাসল। বলল, ওরা কানে কিছু শুনতে পায় না রে বিল্টু। তুই বললেও ওরা কিছু শুনতে পাবে না।

খেতে বসে হাবুলকাকিমা বললেন, আজকে তোমরা একটা অন্যায় করেছো। ফিরতে খুব দেরী করেছো।

—ঐ সুমনটার জন্য। বিল্টু বলল।

সুমন কোন কথা না বলে কটমট করে তাকালো আর তাই দেখে বিল্টু চুপ করে গেল।

হাবুলকাকিমা বললেন, জায়গাটা নতুন তো! তোমরা তো সব পথঘাট চেনো না। তাই আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল।

সুমন বলল, না কাকিমা! চিন্তার কি আছে! এখানে সবাই তো খুব ভাল। তাছাড়া ছোট জায়গা। তাই হারাবারও কোন ভয় নেই।

হাবুলকাকিমা বললেন,—ভয় নেই ঠিক কথা। তবে তোমার হাবুলকাকা বলেন, ভয় নেই বলেই ভয়ের কথা। কেননা, কোন কিছুর ভয় থাকলে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য তুমি তৈরী থাকতে। ভয় না থাকলে তুমি তৈরী থাকবে না। তখন অতর্কিতে কিছু ঘটে যেতে পারে।

—আমাদের সঙ্গে হান্টার ছিল। বিল্টু কথা শেষ করার আগেই সুমনের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেল। টেবিলের নিচে বাঁহাত দিয়ে সুমন এক চিমটি দিল বিল্টুকে!

—হান্টার? কোথায় পেলে? হাবুলকাকিমা বললেন।

—হাবুলকাকার হান্টারটা কাকিমা। আজ যাবার সময় আপনিইতো আমাদের দিলেন।

অবাক হবার ভান করে কাকিমা বললেন, আমি দিয়েছি? এই দেখ। এই আমার এক রোগ। খালি খালি ভুলে যাই। একটু থেমে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। তোমাদের হাবুলকাকার ছোট হান্টারটা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম।

কথা শেষ করে হাবুলকাকিমা ফিক্ করে হাসলেন। তারপ বললেন, বেশ করেছো। এবার থেকে ওটা সঙ্গে রেখো। যদিও খুব ছোট, তবুও লাঠি তো।

সুমন বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়লো। তারপর খাবারের দিকে চোখ রেখে বলল, কাকিমা আপনি কখনও ডোঙ্গরগড় পাহাড়ে উঠেছেন?

কাকিমাকে দেখে মনে হল এবার খুব চিন্তায় পড়েছেন। বললেন, তার আগে বল, তোমরা কি আজ পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিলে?

—না, না। সুমন বলল, পাহাড়ের সামনের রাস্তাটা অবধি গিয়ে চলে এসেছি।

—ওই পাহাড়ে তোমরা হাবুলকাকাকে ছাড়া কখনও যেয়ো না। বহুকালের পুরনো পাহাড়। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় নাকি পাহাড়ের ওই চূড়ায় এক মন্দির হয়েছিল। সেখানে এখনো রোজ আরতি হয়। এই পাহাড়কে নিয়ে ভয়ংকর সব গল্প আছে।

হাবুলকাকিমা থামলেন। সবার পাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাত চালাও। খেতে শুরু কর। খেতে খেতে আমি সব বলবো।

সুমন বলল, বলুন।

হাবুলকাকিমা বললেন, না। আমি গুছিয়ে গল্প বলতে পারি না। হাবুলকাকা আসুক। তার মুখে শুনবে। আবার গল্প শুনে তোমাদের ভয় করবে না তো!

—না। আমাদের খুব সাহস আছে। ভয় পায় তো ভীতুরা। সুমন বলল।

—ভয়ংকর একটা মানুষ এখানে ছিল। সে নাকি কি সব কান্ডমান্ড করতো। তাকে ধরার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। ধরা যায় নি। লোকটা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলে যায়।—কাকিমা গল্প বলতে বলতে থেমে পড়লেন। বললেন, শোনো, এখানে আর একটা খুব ভয়ের জিনিস আছে। এখানে কিন্তু খুব সাপ আছে। বিষাক্ত সব সাপ।

বিল্টু বলল, সাপেরা কোথায় থাকে?

হাবুলকাকিমা হেসে ফেললেন। বললেন, সাপেদের বাড়ির ঠিকানা তো আমি জানি না। তবে পাহাড়ে, পথে

ঘাটে সব জায়গাতেই থাকে।

—বাঁশঝাড়ে? বিল্টু প্রশ্ন করল।

হাবুলকাকিমা বললেন, হ্যাঁ। ওখানে তো চন্দ্রবোড়া আর কেউটের রাজত্ব।

বিল্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, লতা লতা লতা।

সুমন আর হাবুলকাকিমা শব্দ করে হেসে উঠলেন।

বিকাল হতে না হতেই সুমন তাড়া দিল। এই বিল্টু রেডি হ। হাবুলকাকিমার ঘুম ভাঙ্গার আগেই বের হবো।

বিল্টু না শোনার ভান করে বই পড়ছিল। সুমন বিল্টুর হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে বলল,—কিরে কানে গেল আমি কি বললাম।

বিল্টু বলল, আজও যাবি?

সুমন উঠে জামা গায়ে দিতে দিতে বলল, আমি যাচ্ছি। তুই যদি না যাস তো থাক।

বিল্টু সুড়সুড় করে উঠে পড়ল। বলল, আমি যাবো না বলেছি নাকি? আমি বলছিলাম, এত তাড়াতাড়ি যাবি?

বিল্টু আর সুমন যখন নদীর কাছে এসে পোঁছল তখনও বেশ রোদ আছে। এখানে মাটির রঙ লালচে।

গায়ে মাটি ঘসে ঘসে কয়েকজন স্নান করছিল। বেলা মরে আসতে এখনও অনেক বাকি।
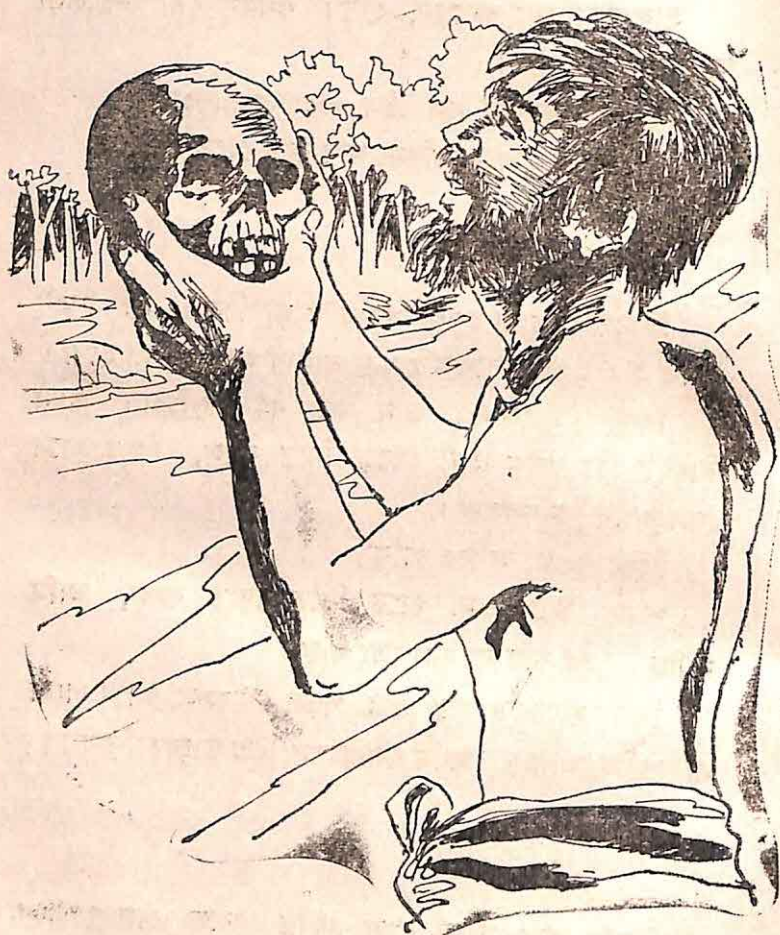
একটা লোক মাথার খুলিটাকে ধরে……

একটি লোক স্নান করছিল। কিন্তু তার সামনে রাখা একটা মানুষের খুলি দেখে সুমন চমকে উঠল। লোকটা গায়ে মাটি ঘসতে ঘসতে উঠে এসে একটা লাল রঙের কাপড় দিয়ে সেই মড়ার মাথার খুলিটাকে ঢেকে দিল। তারপর চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে, আবার জলে নামল।

বিল্টু এত কিছু দেখতে পায় নি। আসলে লোকটি যখন মাথার খুলি চাপা দিল তার পর থেকেই সে লোকটিকে লক্ষ্য করেছে। সে বলল, কিরে সুমন অমন করে কি দেখছিস?

সুমন বলল, ঐ যে লোকটা দেখছিস স্নান করছে, ও এইমাত্র একটা মাথার খুলি একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা দিল।

বিল্টু ভাল করে তাকিয়ে দেখল, লোকটার মুখে একগাল দাড়ি। মাথার চুল কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথার খুলি শুনেই ওর গা শিরশির করছিল।

সুমন বলল, আয়, বেড়াবার ভান করে আমরা ঘুরি আর ওর দিকে চোখ রাখি।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র তন্ত্র আওড়ালো। স্নান করে উঠে খুব সাবধানে কাপড়ে জড়িয়ে নিল খুলিটা। তারপর হাঁটতে শুরু করল। সুমন আর বিল্টুও হাঁটতে হাঁটতে লোকটির সামনে এসে পড়ল।

লোকটি সুমনকে দেখে কি মনে করে হাসলো। সুমন দেখল, স্নান করার পরও লোকটির কপালে লাল সিঁদুরের

দাগ। তার চোখ দুটিও অতিরিক্ত উজ্বল। মেদহীন ছিপছিপে চেহারা।

সুমন লোকটির পুঁটলির দিকে তাকালো। তারপর বলল, আপনি এখানে থাকেন?

লোকটি হো হো করে হাসল। এত জোরে হাসল যে দুটো শালিক পাখি উড়ে পালাল ভয় পেয়ে। তারপর বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বলল, বাঙ্গালীবাবুরা বেড়াইতে আইয়েছেন? যাবেন আমার বাড়ি। ওই পাহাড়ে আমার মকান আছে। কথা শেষ করে লোকটা আবার সেই বুক কাঁপানো হাসি হাসল।

সুমন বলল, আপনি বাংলা বলতে বুঝতে পারেন?

লোকটি বলল, আমি বাংলা মুলুকে বহুৎ দিন ছিলাম। সব সমঝাতে পারি কিন্তু সব বলতে পারি না। বাংলা মুলুক ছেড়ে চলে আসতে হল—কথাটা শেষ না করে লোকটি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

সুমন বলল, আপনার হাতে পুঁটলিতে কি আছে?

লোকটি আর একবার সেইরকম বিকট ভাবে হেসে উঠল। বলল, পুঁটলির মতলব? পুঁটলি কি? এতে আমার জান আছে। জান মানে বোঝ বাঙালীবাবু—লোকটি বুক থাবড়াতে থাবড়াতে বলল, জান, এটাকে জান বলে। লোকটি আর কথা না বাড়িয়ে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, সাঁঝ নামছে। আমি চললাম।

ওরা দুজনে দেখল, লোকটি হন হন করে চলে যাচ্ছে।

বিল্টু এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। লোকটি চলে যাবার পর বলল, কি সাংঘাতিক লোকরে বাবা, হাসি শুনলে প্রাণ কাঁপে।

সুমন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আজ এস্পার-ওস্পার। আজ রাস্তার বাঁকে সেই লোকটাকে দেখলে তার সঙ্গে কথা বলবো। আমি বুঝতে পেরেছি, এখানে খুব খারাপ কিছু লোক এসেছে। এখন এসব দেখে রাখবো, তারপর হাবুল-কাকা এলে সবাইকে ধরবো।

নদীর ধারে তখন কেউ নেই। আজ মানুষজন কম এসেছে। কয়েকটা গোরু ছাড়া নদীর ধারে আর কেউ ছিল না।

—লোকটা মড়ার খুলি লুকিয়ে ফেলল কেন? সুমন নিজের মনে বিড়বিড় করল। এরা সবাই পাহাড়েই বা যায় কেন? বাংলামুলুক থেকে লোকটা চলেই বা এল কেন?

বিল্টু বলল, ওদের চোখগুলো সব রক্তচোষার মতো। সব সময় লাল।

সুমন অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। একবার এদিক একবার সেদিক ঘুরে ফিরে বিল্টুকে বলল, চল, এইবার সেই পথে যাই।

যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বিল্টু একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকালো। আর তখনি দেখতে পেল, একজন মানুষ একটা মড়ার খুলি আকাশের দিকে তুলে কি যেন বিড়বিড়

করছে নদীর পাশে দাঁড়িয়ে। ছোট একটা ঘটি মতো পাড়ে পড়ে আছে।

বিল্টু সুমনের হাত টেনে ফিসফিস করে বলল, দেখ, কান্ডটা দেখ।

সুমনও অবাক হল। এতক্ষণ কেউ ছিল না। লোকটা হঠাৎ এল কোথা থেকে। এক হতে পারে, ওরা যখন পুব দিকে হাঁটছিল এই লোকটা তখন পশ্চিম দিক থেকে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু ওর হাতেও মাথার খুলি কেন!

ওরা একদৃষ্টে লোকটিকে লক্ষ্য করছিল। লোকটি বিড়-বিড় করা শেষ করে খুলিটাকে নদীর জলে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার খুলিটাকে তুলে আনলো। ঘটিতে জল ভরে, তার ওপর খুলিটাকে রেখে, প্রায় ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের বাঁদিকের রাস্তাটার দিকে চলে গেল।

—এখানে মড়ার খুলি নিয়ে এরা সব কি করে? এত খুলি পেলই বা কি করে? বিল্টু ভয়ে ভয়ে শুধোল।

সুমন বলল, লোকটা এমন ভাবে গেল, যেন আমাদের দেখতে পায় নি। পাহাড়ের বাঁ দিকে গেল। তার মানে ওর ডেরা ঐ দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সেই বাঁশঝাড়ের কাছে পেঁছে গেল। বিল্টু বলল, আজ ওখানে নয়, অন্য কোন গাছের নিচে দাঁড়াবো।

সুমন বলল, আজ ঐ শেওড়া গাছটার নিচে দাঁড়াবো। ওখান থেকে দু'দিকের রাস্তাই দেখা যাবে।

বিল্টু বলল, তোর যা ইচ্ছে কর। আমি বললেই কি আমার কথা তুই শুনবি।

সুমন বিল্টুর কথায় কান দিল না। বলল, শোন, আমি নজর রাখবো ডানদিকের রাস্তায়, তুই বাঁ দিকেরটায়। কিছু দেখলে চেঁচাবি না। হাত দিয়ে ঠেলে দিবি আমাকে, তাহলেই বুঝতে পারবো।

অনেকক্ষণ পরে একজন লোককে দেখা গেল ডানদিকের রাস্তা দিয়ে আসছে। সুমন চাপা গলায় বলল, বিল্টু ডানদিকে তাকিয়ে দেখ।

ওরা দুজনে দেখল, একটা লোক আসছে। চাদরে সারা গা ঢাকা। একবার পিছনে একবার সামনে দেখে নিল বাঁকের মুখে এসে। বিল্টু ফিসফিস করে বলল, কালকের সেই লোকটা।

লোকটা একটু এগিয়ে যেতেই সুমন পরপর দু তিনটে ঢিল ছুঁড়লো তার দিকে। লোকটা থমকে দাঁড়াল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর প্রায় ছোটার মতো জোরে ফিরে চলল পাহাড়ের দিকে।

—বিল্টু আয়, বলে সুমন লোকটার পিছনে পিছনে ছুটল। কি করবে ভেবে না পেয়ে বিল্টুও সুমনের পিছনে দৌড়াল। পাহাড়ের রাস্তা অচেনা। পাথরে ভরা। কাঁচা,

শুধু এক চিলতে রাস্তা। এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে গেছে। চারপাশে বুনো ফুলের গন্ধ। সুমন বিল্টুর হাত থেকে টর্চ নিয়ে জ্বালালো।

বিল্টু বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি রে! ওপাশ থেকে একটা পাথর কেউ গড়িয়ে দিলে আমরা চাপা পড়ে যাবো। এদিকটা খুব ঢালু, দেখেছিস।

সুমন বলল, পাথর গড়ানো অত সোজা নাকি। যাকগে যাক. এখন শোন, আর একটাও কথা বলবি না। জানবি, পাহাড় হল খুব নির্জন জায়গা। এখানে ফিসফিস করলেও বহু দূর থেকে তা শোনা যায়। তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাবো।

বিল্টুর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। বলল, ধরা পড়লে আমাদের কি হতে পারে রে?

সুমন বলল, তোকে বললাম না. চুপ কর।

টর্চ জ্বালিয়ে অনেক কষ্টে পাহাড়ের প্রথম বাঁকের মুখে আসতে না আসতেই একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে সুমন দাঁড়িয়ে পড়ল। বিল্টু সুমনকে জড়িয়ে ধরে বলল, এইবার আমাদের কি হবে!

সুমন ফিসফিস করে বলল, চুপ কর। চল, আমরা পাহাড়ের একধারে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকি।

আওয়াজটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কয়েকজন লোক ছুটতে ছুটতে আসছে। ছুটে যেতে যেতে ওদের একজনের নজর পড়ল সুমন বিল্টুর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল—ইধার মিল গিয়া।

এতক্ষণে সুমন দেখতে পেল, লোকগুলোর সকলের হাতেই ছুরি, রামদা, বল্লম কিছু না কিছু আছে। মোট পাঁচজন। বিল্টু চোখ বুজে সুমনকে আঁকড়ে ধরে রইল। লোকগুলো পায়ে পায়ে সুমনদের দিকে এগিয়ে এল।

ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। পাহাড়ে সেই হাসির প্রতিধ্বনি আরো ভয়ংকর শোনালো। ওদেরই দলের একজন ওকে বলল, হাসতা কিঁউ রে।

যে হাসছিল সে আর একদফা হেসে বলল, এ তো উহ নেহি হ্যায়। এ হ্যায় বাঙ্গালীবাবু।

লোকটার কথা শেষ হওয়া মাত্র সুমন তার দিকে তাকালো। আধো অন্ধকারে ভাল করে ঠাহর করা যায় নি। এইবার তার মনে পড়ল, এই লোকটাই কাপড় দিয়ে মানুষের মাথার খুলি চাপা দিয়ে নদী থেকে উঠে এসেছিল।

লোকগুলো চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল। বিল্টু শব্দ না করে কাঁদছিল। সুমন চাপা গলায় বলল, এখন কাঁদবি না। কাঁদতে দেখলে ওরা আরো পেয়ে বসবে। বিল্টু আরো জোরে সুমনকে জড়িয়ে ধরল।

লোকগুলো এবার ওদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। আধো হিন্দি আধো বাংলায়, বিকাল বেলা নদীর ধারে দেখা লোকটা বলল, এখানে কিঁউ এসেছো বাঙ্গালীবাবু। বাড়ি ফিরে যাও। চল আমি পহুঁচায়ে দিয়ে আসি।

সুমন বলল, না, না, তার দরকার নেই। আমরাই যেতে পারবো। সুমনের মনে হল, লোকগুলো আসলে ওদের বাড়ি চিনে নিতে চায়। কথা ঘোরাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, তোমাদের হাতে এত অস্ত্র কেন?

লোকটা আবার সেই পাহাড় কাঁপানো ভয়ংকর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, একটা দুষমনকে খুঁজতে বের হয়েছিলাম। লেকিন তাকে মিলল না।

বিল্টু ফিস ফিস করে সুমনকে বলল, আমাদের তো যেতে বলল। চল, এখনই চলে যাই।

সুমন বলল, হুঁ। তারপর সেই লোকগুলোর দিকে ফিরে বলল, তোমরা তোমাদের দিকে যাও। আমরা ফিরে যাচ্ছি।

সুমনের কথা শুনে ওরা সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ল। সুমন লক্ষ্য করল, ওদের সকলের হাসিই একরকমের। এমন হাসি শুনলে বুকের মধ্যে শিরশির করে ওঠে।

বাড়ি ফিরে সুমন থমকে দাঁড়াল। হাবুলকাকা বাইরের

খবরের কাগজটা রাখতে রাখতে হাবুলকাকা বললেন।

ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন। সুমন ইশারায় বিল্টুকে দেখাল হাবুলকাকাকে। বিল্টু খুব সাবধানে দরজা আটকে উঠোনের দিকে পা বাড়াল।

ঠিক তক্ষুনি কাগজ থেকে চোখ না তুলেই হাবুলকাকা বললেন, এই যে বিল্টু, সুমন। তোমাদের ঘোরা হল? কোথায় গিয়েছিলে আজ—পাহাড়ের দিকে?

বিল্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমার কোন দোষ নেই হাবুলকাকা। সুমন আমাকে জোর করে রোজ নিয়ে যায়।

সুমন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হাবুলকাকা বললেন, এত কাছে একটা পাহাড়। না গিয়ে কি পারা যায়! তোমরা গিয়েছ ঠিকই করেছো। তবে সন্ধ্যে করে ফেরাটা তোমাদের উচিত হয় নি।

ওরা হাত পা ধুয়ে এসে বলল, হাবুলকাকা এবার দন্ডকারণ্যের গল্প বলুন।

হাবুলকাকা বললেন, দণ্ডকারণ্যের কি গল্প!

বিল্টু বলল, দণ্ডাকারণ্যে তো শুধু অরণ্য। সেই জন্যেই তো ঐ রকম নাম হয়েছে। এখানে বাঘ ভালুক সবই আছে হাবুলকাকা, তাই না?

হাবুলকাকা চকিতে একবার হাবুলকাকিমার দিকে তাকালেন, তারপর চোখ বড় বড় করে বললেন, বাঘ ভালুক। বলছ কি! ওতো রাস্তার মোড় পার হলেই দেখা যেতো।

সুমন বলল, এখনও দেখা যায়।

হাবুলকাকা এবার শব্দ করে হাসলেন। হাতের কাগজটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, আরে না, না। এখন দন্ডকারণ্য আর সে রকম নেই। এখন বন কেটে বসত বানিয়েছে মানুষ। বাঘ ভালুক যে নেই তা নয়। তবে সেগুলো থাকে অনেক দূরের বনে।

বিল্টু বলল, ঈস, এবার তাহলে কিছুই দেখতে পাননি আপনি।

হাবুলকাকা বললেন, কিছু যে দেখিনি তা নয়। তবে তেমন কিছু নয়। যাই হোক, যা দেখেছি তাই তোমাদের বলি।

ওরা ঘন হয়ে বসল। হাবুলকাকিমা বললেন, তোমাদের গল্প শুরু হল, এবার আমারও কাজের শুরু। আমি রান্নাঘরে যাই। তোমরা গল্প শোন।

সুমন বলল, কাকিমা আপনি শুনবেন না?

হাবুলকাকিমা বললেন, আমি পরে তোমার থেকে শুনে নেবো, খন। দেখো, বলার সময় আবার ভুলে যেও না যেন সব কিছু।

সুমন বলল, আপনি দেখবেন কাকিমা, আমি হুবহু গল্পটা আপনাকে শোনাবো।

হাবুলকাকা বললেন, এটা কিন্তু গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। আমি রায়পুর থেকে দন্ডকারণ্য রওনা হলাম। মাঝে আবাহনপুরে একবার থামলাম। ওখানকার মিষ্টি খুব ভাল তো।

বিল্টু বলে উঠল, খুব বড় বড় রাজভোগ, হাবুলকাকা?

হাবুলকাকা হাসতে হাসতে বললেন, না ওখানে সবচেয়ে ভাল কালাকান্দ আর প্যাঁড়া, গরম জিলিপিটাও মন্দ নয়। দেখি, যদি পারি তোদেরও একবার ঘুরিয়ে আনবো।

সুমন বলল, তারপর ওখান থেকে কোথায় গেলেন?

—ওখান থেকে গেলাম কাঁকের। আর সেখানেই ঘটেছিল কান্ডটা, হাবুলকাকা বললেন। আবাহনপুর থেকে সোজা চলে গেলে প্রথমে পড়ে কাঁকের। তারপর কেশকল পাহাড়। কেশকল পাহাড় থেকেই দণ্ডকের শুরু। সে কথা থাক। কাঁকেরে আমার এক বন্ধু থাকে। সে আমাকে বলল, কাঁকেরের পাহাড়ের মাথায় যে মন্দির আছে তার কাছেই জল জমে একটি লেক মতো হয়েছে। আর তাতে প্রচুর বালিহাঁস এসে বসছে। বালি হাসের মাংসতো দারুণ খেতে। অনেকদিন খাইওনি। ভাবলাম, একবার গেলে হয়।

আমার বন্ধুটি বলল, বন্দুক, ছররা গুলি সব থাকবে। চলই না।

আমিও ভাবলাম, মন্দ কি। কাজের ফাঁকে একবার ঘুরে এলেই হবে। রবিবার সকালে তো আমরা রওনা হলাম। কেশকল পাহাড়ে কোন গাছ নেই। কালো কালো পাথর। একটার গায়ে আরেকটা, তার গায়ে আরেকটা—এই ভাবেই বিরাট পাহাড়টা রয়েছে। আমরা তো ঘন্টা দুয়েক অনেক ঘাম ঝরিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম। ওখানে দেখি, একটা লোহার দন্ড আছে।

আমি ভাবলাম কি না কি! আমার বন্ধু বলল, ওটা একটা শূল। অনেক অনেক দিন আগে কাঁকেরের এক রাজামশাই ওটা অত উঁচুতে বসিয়েছিলেন। দুষ্টু পাজি লোকেদের ঐ শূলে চড়ানো হতো। সবাই যাতে দূর দূর থেকেও দেখতে পায় সেজন্য অত উঁচুতে শূল বসানো হয়েছিল।

—শূল তো! জানি, জানি। লোককে শূলের ওপর চড়িয়ে ছেঁদা করে দেওয়া হতো, সুমন বলল।

হাবুলকাকা বললেন, হ্যাঁ। তা সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আমরা দেখলাম, একটু দূরে দেখা যাচ্ছে একটা লেক বা সরোবর। রোদের আলোয় জল চিকচিক করছে। আর ঝাঁক ঝাঁক বেলেহাঁস দেখলাম সাঁতার কাটছে। সরোবরের চারপাশ জুড়ে জঙ্গল হয়ে গেছে। জলের আশপাশে যেমন হয় তেমন সব গাছে ভরে আছে জায়গাটা।

আমরা সরোবরের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি আগে, বন্ধু পিছনে পিছনে। বন্দুকে ছররা পুরে আমি তৈরী। দুহাতে জঙ্গল সরিয়ে তাক ঠিক করে একটা গুলি করলাম। পাহাড়ে কি প্রতিধ্বনি বাপরে! ডানা ঝাপটে সব পাখি পালাল। ছররা গুলি খেয়ে পড়ে রইল পাঁচটা বালিহাঁস। আমার বন্ধু এক বুক জলে নেমে তুলে আনলো সব গুলো। আর ঠিক তখনি শুনি, আমাদের ডানপাশের জঙ্গলে একটা সরসর শব্দ উঠছে। তাকিয়ে দেখি, একটা শঙ্খচূড় ফণা তুলে দুলছে। তার জিভ লক লক করছে। আমরা তাড়াতাড়ি ডাঙার

দেখি, শঙ্খচূড় মাথা তুলে দুলছে।

দিকে উঠে এলাম। সাপটা আস্তে আস্তে ফণা উঁচু করতে থাকলো। প্রায় চার ফুট মত ফণা তুলেছে, তখন দেখি বন্ধুটির অবস্থা কাহিল। তার কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে।

আমি দেখলাম, আর সময় নষ্ট করা যায় না। আমি আর একটা ছররা বন্দুকে পুরে টিপ করতে যাবো, হঠাৎ দেখি সাপটা ফণা নামিয়ে আমাদের দিকেই তেড়ে আসছে। সে এক ভয়ংকর অবস্থা। ঐ সাপ এরপর ছোবল দিলে পাহাড় থেকে আর নেমে আসা যাবে না। আবার এত জোরে আসছে যে ঠিকমতো তাকও করতে পারছি না। তখন ঠিক করলাম—যা থাকে কপালে—আগে গুলি তো করি। গুলি করলাম। সাপের লেজের দিকটা উড়ে গেল। কিন্তু মাথার কাছে হাতখানেক তখন পাক খাচ্ছে। তারপর সেটাকেও শেষ করলাম। নামার পথে অবশ্য আর কিছু দেখতে পাইনি।

বিল্টু বলল, আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি।

সুমন খুব বিজ্ঞের মতো বলল, ও কিছু নয় রে। শিকারীদের ওরকম হয়েই থাকে। আর হাবুলকাকা কি আজ থেকে শিকার করছেন!

সুমন খুব গম্ভীরভাবে বলল, হাবুলকাকা, আপনার সঙ্গে আরও কয়েকটা কথা আছে। ভয়ংকর একটা ব্যাপার পাহাড়টাকে ঘিরে আছে। আমি অদ্ভুত সব লোকজন দেখেছি।

হাবুলকাকার কপালে ভাঁজ পড়ল। খবরের কাগজটা

ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললেন, তাই নাকি? বল, কি দেখেছ তোমরা।

সুমন আড়চোখে দেখল কাকিমা দরজায় দাঁড়িয়ে একটা পেয়ারা দেখাচ্ছে তাকে। হাত তুলে কাকিমাকে অপেক্ষা করতে বলে সুমন হাবুলকাকাকে নদীর ধারের সব কথা, মড়ার মাথার খুলি নেওয়া লোকটা, সাদা কাপড়ে মোড়া লোকটা, পাহাড়ের বাঁকে অস্ত্রশস্ত্র নেওয়া লোকগুলোর সব কথা হাবুলকাকাকে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

হাবুলকাকা খুব মন দিয়ে সুমনের সব কথা শুনলেন। তারপর বললেন, তোমাদের তো দেখছি বেশ সাহস আছে। তবে ব্যাপারটা কি জান, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা যার আছে তার সাহস থাকলে সেটা খুব ভাল হয়। কিন্তু ধর, শুধু সাহস আছে কিন্তু অন্য কোন অভিজ্ঞতা নেই—সেটা কিন্তু ভয়ের কথা। কেননা সেখানে এই সাহসই তোমাকে বিপদের দিকে নিয়ে যাবে। তোমাদের সাহস আছে আমি স্বীকার করছি। সাহস থাকা খুব ভাল। কিন্তু সব শুনে মনে হচ্ছে তোমরা একেবারে বিপদের সীমানা থেকে ফিরে এসেছো।

সুমন বলল, হাবুলকাকা আমরা কি ভুল করেছি?

হাবুলকাকা বললেন, না সবটা ভুল করনি। অনেকটাই ঠিক কাজ করেছো, আবার একটুখানি ভুল কাজও করেছো। ও কিছু-নয়। শোন, কাল সকালে আমি একলা পাহাড়ে যাবো। বিকালে তোমাদেরও ওখানে নিয়ে যাবো।

সুমন ছুটে এসে হাবুলকাকার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। বলল, আমাদের মন্দিরে নিয়ে যাবেন হাবুলকাকা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আপনার সঙ্গে পাহাড়ে উঠে আমরা বেশ মন্দিরটায় যাবো।

হাবুলকাকা চিন্তিতভাবে বললেন, আগে সকালে পাহাড় থেকে ঘুরে তো আসি। বিকালের কথা বিকালে।

হাবুলকাকা পাহাড় থেকে যখন ফিরে এলেন তখন বেলা প্রায় একটা। বিল্টু বার কয়েক বলেছে, হাবুলকাকা তো এখনও আসছেন না।

হাবুলকাকিমা প্রতিবারই হেসেছেন। বলেছেন, কোন চিন্তা নেই। তোমার হাবুলকাকাকে সবাই ভয় পায়। পঁচিশটা বাঘ মেরেছেন উনি। দুর্দান্ত ডাকাতকে বনের মধ্যে পাকড়েছেন ছ-বার।

হাবুলকাকা জামা কাপড় ছেড়ে এসে খুব গম্ভীর মুখে বললেন, দাও, আমায় ভাত দাও। সুমন বিল্টু, তোমরা খেয়ে নিয়েছো তো?

সুমন বলল, আমরা বেলা এগারোটায় খেয়ে নিয়েছি।

হাবুলকাকা খেতে খেতে বললেন, যাও, এখন গিয়ে শুয়ে পড়। আজ বিকাল পাঁচটায় আমার সঙ্গে তোমরা যাবে পাহাড়ে।

বিছানায় শুয়ে বিল্টু বলল, আজ আমাদের আর কোন ভয় নেই। হাবুলকাকা সঙ্গে থাকবেন। ব্যস, নিশ্চিন্ত।

সুমন বলল, আমি তুই আর হাবুলকাকা। আমরা হলাম তিনজন। ধর, ওরা যদি সাতজন থাকে তাহলে আমাদেরও লড়তে হবে।

বিল্টু বলল, তুই থাম তো। তোর মুখে যত অ-কথা কু-কথা। ওরা সাতজন আসবে কেন? হাবুলকাকাকে দেখলেই ওরা পালিয়ে যাবে না!

সুমন বলল, তা নাও হতে পারে। হাবুলকাকিমার কাছে শুনেছি যে হাবুলকাকা একাই ছয় ছয় জন ডাকাতকে ধরেছেন। এখন ওরা যদি হাবুলকাকাকে বাগে পায় তাহলে একহাত দেখে নেবার চেষ্টা করবে। তখন হাবুলকাকার সঙ্গে আমাদেরও লড়তে হবে।

বিল্টু বলল, আমরা আবার কি নিয়ে লড়ব?

সুমন কটমট করে বিল্টুর দিকে তাকালো। তারপর বলল, তোর মত ভীতুদের জীবনে কিছু হবেনা। তোরা আবার লড়বি! আমি আর হাবুলকাকা যখন ওদের সঙ্গে লড়বো তখন তুই দূরে বসে বসে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবি।

বিল্টু এবার রেগে উঠল। বলল, বাজে বকিসনা। এই যে তোর সঙ্গে একা একা টৈ টৈ করে পাহাড়ে নদীর ধারে এত কান্ড করলাম—কই একবারও কি কেঁদেছি?

সুমন বলল, আর বকবক করিস না। এখন একটু ঘুমিয়ে নে। হাবুলকাকা বললেন না একটু ঘুমিয়ে নিতে ?

বিল্টু পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, তোর সঙ্গে কথা বলার থেকে ঘুমোনোই ভাল।

ওদের কারোর ঘুম আসছিল না। উত্তেজনায় ওরা টগবগ করে ফুটছিল ; বিল্টুরও সাহস বেড়ে গিয়েছিল হাবুলকাকা ফিরে আসাতে।

ঠিক চারটার সময় হাবুলকাকা ডাকলেন, সুমন, বিল্টু এবার তোমরা খাবার-টাবার খেয়ে তৈরী হও আস্তে আস্তে।

ধুরমুর করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সুমন। তার পিছু পিছু বিল্টু।

টেবিলে হাবুলকাকিমা খাবার সাজিয়েই রেখেছিলেন। হাবুলকাকা একটা গামবুট পায়ে, ট্রাউজারস আর হাফসার্ট গায়ে দিয়ে একটা ছোট রিভলবারে গুলি ভরছিলেন। সুমনকে দেখে বললেন, এটাও সঙ্গে রেখে দিচ্ছি। সব সময়ই আমার সঙ্গে এটা থাকে। এটা দেখে তোমরা ঘাবড়িয়ে যেয়ো না। একটু থেমে হাবুলকাকা বললেন, এই রিভলবারটার সাই-লেন্সার সিসটেম। তার মানে হল, এতে জোরে শব্দ হয়না। চাপা হিস শব্দ ওঠে গুলি চালালে।

সুমন সঙ্গে টর্চ আর হান্টারটা নিল।

হাবুলকাকিমা বললেন, গল্পটা পরে তোমাদের কাছে শুনে নেব।

হাবুলকাকা বললেন, দ্যাটস গুড। টর্চ সঙ্গে থাকাটা খুব দরকার। থ্যাঙ্ক ইউ সুমন।

হাবুলকাকা নদীর ধারে এসে বললেন, তোমরা খেয়াল করেছ কিনা জানিনা—এই নদীর জল আকাশের রঙের সঙ্গে পালটে যায়। একদিন ভোর সকালে তোমাদের এখানে নিয়ে আসবো। দেখবে, সূর্য ওঠার সময় এই নদীর জলও কেমন লালচে হয়ে ওঠে।

সুমন বলল, এখনও একটা ফিকে লাল ভাব আছে জলে।

হাবুলকাকা বললেন, ঠিক বলেছ। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। এই আলোটাকে বলা হয় গোধূলীর আলো। আর কি আশ্চর্য জান! পাখিরা এই আলো দেখলে চিনতে পারে। বোঝে, দিন শেষ হয়ে এল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তখন তাদের বাসায় ফিরে যায়।

মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক কাক উড়ে যাচ্ছিল। বিল্টু বলল, ঐ দেখুন হাবুলকাকা, একদল কাক উড়ে যাচ্ছে।

হাবুলকাকা আঙ্গুল তুলে নদীর পশ্চিম দিকটা দেখালেন। একঝাঁক পাখি এক লাইনে উড়ে যাচ্ছিল সেদিক দিয়ে। হাবুল-কাকা বললেন, ঐ যে দেখছ, ও গুলো বকের মত দেখতে কিন্তু বক নয়। ওর নাম কাদাখোঁচা পাখি। বক ধবধবে সাদা। আর কাদাখোঁচা পাখিদের রংটা একটু ময়লা, মাটি মাটি রং অনেকটা।

সুমন বলল, ওরাও তো মাছ খায়।

হাবুলকাকা বললেন, হ্যাঁ। ওরা বকের মতো শুধু দেখতে নয়। স্বভাবেও। শুধু রংটা একটু আলাদা এই যা।

বিল্টু বলল, যেমন আমরাও মানুষ আবার সাহেবরাও মানুষ। শুধু রংয়ে যা তফাৎ তাই না হাবুলকাকা!

হাবুলকাকা বললেন, ঠিক। একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক কথা বলেছে।

নদীতে এদিন কম লোক স্নান করছিল। বিল্টু সুমন যাদের দেখেছিল সেই মানুষের খুলি হাতে নেওয়া লোকগুলোকে দেখা গেলনা।

বিল্টু হাঁটতে হাঁটতে বলল, জানেন হাবুলকাকা, ঐ ঘাটে ওরা স্নান করছিল। মানুষের খুলি হাতে নিয়ে ওরা পাহাড়ের দিকে ফিরে গিয়েছিল। আজ আর ওদের দেখা যাচ্ছেনা।

হাবুলকাকা হাসলেন। বললেন, জানি। এও জানি যে, ওরা রোজ এখানে আসেনা। সপ্তাহে দুদিন আসে।

সুমন বলল, হাবুলকাকা আপনি ওদের চেনেন।

হাবুলকাকা হঠাৎ খুব গম্ভীর ভাবে বললেন হ্যাঁ চিনি। কিন্তু সে কথা এখন থাক। তোমরা একটা চমৎকার জিনিস এখন দেখতে পাচ্ছ, অথচ আশ্চর্য, তোমরা কেউ তো সে কথা বলছোনা।

সুমন বিল্টু এপাশ ওপাশ তাকালো। কিন্তু কি বলবে ভেবে পেলনা।

হাবুলকাকা বললেন, ঐযে গাছগুলোতে থরে থরে শিমুল পলাশ ফুটে আছে সেটা তো তোমারা দেখছো না। দেখ, কেমন লাল টকটকে ফুলগুলো।

বিল্টু বলল, দেখলে মনে হয়, যেন কেউ রং করে রেখেছে।

হাবুলকাকা বিল্টুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ঠিক বলেছো। নেচার, মানে প্রকৃতি এমন রং দেয় যে বলার নয়। দেখ গাছগুলোর এ-সময়ে কোন পাতা থাকেনা, সব গাছ জুড়ে শুধু লাল টকটকে ফুল।

ডোঙ্গরগড় পাহাড়ের গায় কোথাও কেউ ধোঁয়া দিয়েছে। আকাশের গা বেয়ে নীল ধোঁয়া ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল। হাবুলকাকা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, পাহাড় যত উঁচু হয় তত তার রূপ খোলে। ছায়ায় একরকম, রোদে আর একরকম দেখায়। এখন গরমের দিন। তাই অতটা ভাল লাগছে না। কিন্তু শীতকালে যখন কুয়াশা পড়ে তখন এই পাহাড়টাকেই কেমন রহস্যময় দেখায়। মনে হয়, যেন হালকা নীল একটা চাদর কেউ বিছিয়ে দিয়েছে ওর গায়।

বিল্টু হঠাৎ বলে উঠল, হাবুলকাকা দেখুন, নদী থেকে ছোঁ মেরে কি যেন তুলে নিল ওই পাখিটা।

হাবুলকাকা বললেন, ওটা হল মাছরাঙ্গা। কি চমৎকার

সব রং ওর গায়ে। ওরা ঠিক বুঝতে পারে জলের মধ্যে কোথায় মাছ থাকে।

—আমাদের ওখানে এসব পাখি দেখা যায়না। সুমন বলল।

—শহরে এসব পাখি কম দেখা যায়। শহরের মধ্যে নদী, পুকুর এসব তো বেশী থাকে না। আর এসব না থাকলে সেখানে মাছরাঙ্গাও যায় না। তাই দেখতে পাও না।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাবুলকাকা সুমন আর বিল্টুকে ফিঙে পাখি আর পাহাড়ী শালিক দেখালেন। বারকয়েক এপাশ ওপাশ ঘুরলেন। তারপর বললেন, চল, এবার সময় হয়েছে। আমরা এবার সেই জায়গাতে যাই।

বিল্টুর সঙ্গে সঙ্গে বুক দুরদুর করে উঠল। সুমন ছুটে এসে হাবুলকাকার হাত ধরে বলল, চলুন, চলুন হাবুলকাকা। ওখানে যাবার জন্যইতো আজ আমরা বের হয়েছি।

পাহাড়ের কাছে পৌছতেই সুমন আর বিল্টু অবাক। পাহাড়ের সব লোকগুলো হাবুলকাকাকে দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

হাবুলকাকা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, সবাই এসে গেছ। শোন, গাছগুলোর গোড়ায় গোড়ায় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াও।

সুমন বলল, হাবুলকাকা এই লোকগুলো কি তবে ভাল ?

সুমন বলল, হাবুলকাকা এই লোকগুলোইতো পাহাড়ের সেই সব লোক। আমার সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। এই লোকগুলো কি তবে ভাল।

হাবুলকাকা হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ। এরা মন্দিরের পুরোহিত। মানুষের মাথার খুলি সামনে রেখে ওরা ধ্যান করে। কোথাও খুলি পেলে ওরা সেইজন্যে নিয়ে আসে। আজ সকালে পাহাড়ে গিয়ে শুনলাম যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুরণো মন্দিরে ক'দিন ধরে চোর আসছে। বিগ্রহের মাথার মুকুট সোনার। চোখ দুটো হীরের। এর আগেও দু'বার এখানে চুরি হয়েছে। আমরা সবাই আজ পাহারা দেব। একটু থেমে হাবুককাকা বললেন, সুমন, তোমরা সাদা কাপড়ে ঢাকা যে লোকটার কথা বলেছো তাকে এরা কেউ চেনে না। সেই লোকটাকে তোমরা চুপিচুপি চিনিয়ে দেব। কে জানে, সে-ই হয়তো চোর। আর যদি তাই হয়, তাহলে এক দারুণ কান্ডমান্ড হবে।

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক সন্ধ্যের পর যখন অন্ধকার একটু গাঢ় হয়েছে, মন্দিরের আলো জ্বলে উঠেছে তখন হন হন করে একটা লোক পাহাড়ে ওঠার ডানদিকের রাস্তার দিকে এগিয়ে এল। লোকটার সারা শরীর একটা সাদা চাদরে ঢাকা। হাতে একটা হ্যারিকেন। হাবুলকাকা

একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলেন। সুমন ফিসফিস করে বলল, সেই লোকটা হাবুলকাকা!

পাহাড়ের সামনে এসে লোকটা একবার পেছনে ঘুরে দেখে নিল। তারপর হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে গেল। আর তখনি হাবুলকাকা চাপা গলায় বললেন, চল, ওর পিছু পিছু। কেউ কোন শব্দ করবে না। আলো জ্বালবে না।

খুব সাবধানে পাহাড়ের খাড়াই পথ দিয়ে সবাই উঠে চলল। সেই লোকটিকে আর দেখা যাচ্ছিল না। কারো মুখে কোন কথা নেই। তিন নম্বর বাঁকের মুখে এসে হাবুলকাকা থমকে দাঁড়ালেন। একটা ঝোপের ভেতর অল্প একটু আলো দেখে তিনি সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে ঝোপ সরিয়ে একটা হ্যারিকেন বের করে আনলেন।

হাবুলকাকা বললেন, এই হ্যারিকেনটা নিশ্চয় ঐ সাদা চাদর ঢাকা লোকটা যাবার সময় বনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে গিয়েছে। ফেরার পথে লোকটা এখান থেকে এই আলোটা নিয়ে যায় বোধহয়।

সুমন বলল, এখান থেকেই আমরা কাঁপা কাঁপা আলোটা দেখতে পেয়েছিলাম। নিচের দিকে তাকিয়ে আমি মনে করতে

পারছি, ঐ দূর থেকে আমরা দেখতাম যে আলোটা কেঁপে কেঁপে নামছে।

আবার সবাই চুপচাপ হাঁটতে শুরু করলে। প্রথমে সেই পাঁচ জন। তার পেছনে হাবুলকাকা, সুমন, বিল্টু। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাকের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে সবাই থমকে দাঁড়াল। দুপাশে টিবির দিকে হাবুলকাকা টর্চ ফেলতেই দেখা গেল, মস্তবড় একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

হাবুলকাকা ঝট করে রিভলবারটা বার করে বাঁ হাতে টর্চটা নিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, কিং কোবরা! কি সাইজ! সাপটা তখন ফণা তুলে দুলছে। ছোবল মারার জন্য তৈরী। এক নিমেষে হাবুলকাকা গুলি ছুঁড়লেন। হিস করে একটা শব্দ হল। সুমন আর বিল্টু দেখল, সাপের ফণাটা উধাও হয়ে গেছে। সাপের নিচের দিকটা ছটকাচ্ছে। হাবুলকাকা বললেন, যাক, একেবারে মাথাটা উড়িয়ে দেওয়া গেছে।

সেই পাঁচজন এবার হাবুলকাকার দিকে ঘুরে বলল, সাবাস রেঞ্জার সাহেব। আপকা নিশানা বহুৎ আচ্ছা হ্যায়।

হাবুলকাকা মুচকি হেসে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। সঙ্গে বিল্টু, সুমন আর ওরা পাঁচজন।

পাহাড়ে ওঠা কত ঝামেলার সুমন আর বিল্টু তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। হাঁফ ধরে যাচ্ছিল ওদের। ঘামে গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছিল। একটা বাঁক পার হতেই সুমন বলে উঠল, ওই তো মন্দির।

হাবুলকাকা চাপা গলায় বললেন, আস্তে কথা বল।

পাহাড়ের শেষ বাঁকটা পার হওয়ার পর অনেকটা জায়গা সমতল। একটু দূরে পাহাড়ের উত্তরদিকে বহুকালের পুরণো একটা মন্দির। সবাই একবার দাঁড়াল ঘন হয়ে। হাবুলকাকা ফিসফিস করে সবাইকে কি যেন বললেন। তারপর সবাই ছড়িয়ে গোল হয়ে গেল। হাবুলকাকা হাত দিয়ে ইশারা করা মাত্র সবাই মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল।

মন্দিরের পেছন দিকে অনেক গাছ। সেই গাছের গায়ে গা মিলিয়ে সবাই হাঁটছিল। মন্দিরের কাছে এসে সবাই চুপ করে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় দেখা গেল, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সাদা কাপড়ে ঢাকা একজন মানুষ হনহন করে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। মন্দিরের পেছনে মাত্র চারটা সিঁড়ি। লোকটা যেন একলাফ দিয়ে নামল।

হাবুলকাকা চিৎকার করে বললেন, স্টপ!

লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাবুলকাকা বললেন, জেরা সে হিলে গা তো গোলি মার দেগা।

লোকটা ঘুরে তাকাল হাবুলকাকার দিকে। হাবুলকাকার হাতের রিভলবার আর ওদের পাঁচজনের হাতের বর্শা, ছুরি, দা দেখে লোকটা কোমর থেকে একটা ছোট পুঁটুলি বের করে জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে দিল।

ওই পাঁচজনের একজন ছুটে গিয়ে পুঁটলিটা খুঁজে আনল। পুঁটলি খুলতেই দেখা গেল সোনার মুকুট, হাতের বালা। লোকটা পুঁটুলিটা হাবুলকাকার হাতে দিয়ে ছুটে গিয়ে ধাঁই করে একটা ঘুসি মারল সাদা কাপড় ঢাকা লোকটাকে।

আচমকা ঘুসি খেয়ে লোকটা ছিটকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাকি চারজন গিয়ে দড়ি দিয়ে লোকটার হাত পা বেঁধে দিল ঝট করে। সুমন বিল্টু এতক্ষণ খেয়াল করেনি ঐ পাঁচ-জনের মধ্যে একজন একটা দড়ি হাতে পেঁচিয়ে হাঁটছিল।

হাবুলকাকা এইবার কাপড় দিয়ে ঢাকা লোকটার পেটে একটা পা রেখে বললেন, সাচ্ বোল। চুরি কিয়া হ্যায়, না?

লোকটা সেই ভয়ংকর চোখে একবার হাবুলকাকা, সুমন বিল্টু আর ওদের পাঁচজনকে দেখে, আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

হাবুলকাকা বললেন, আজ তুম লোক ইসকো বাঁধ কর মন্দির মে রাখো। কাল পুলিস কো ভেজ দেগা। ইসকো লে যায় গা। মৈঁ আভী ঘর যা রহা হুঁ।

পাঁচজন লোকই একই সঙ্গে ঘাড় নাড়তে নাড়তে সমানে হাবুলকাকাকে কি সব বলেছিল। ভাষা না বুঝলেও সুমন-বিল্টু বুঝতে পারছিল, ওরা হাবুলকাকাকে এখন ছাড়তে চায় না। কিন্তু হাবুলকাকা নাছোড়বান্দা। তখন ওদের মধ্যে একজন মন্দিরে ছুটে গিয়ে মিঠাই নিয়ে এল। হাবুলকাকা, সুমন, বিল্টু যখন মিষ্টি খাচ্ছিল তখন ওরা পাঁচজনই খুব আদর করছিল সুমন আর বিল্টুকে। তারপর পাহাড়ের

নিচ পর্যন্ত ওদের মধ্যে দুজন এসে এগিয়ে দিল হাবুলকাকা বিল্টু আর সুমনকে।

ফেরার পথে সুমন বলল, কি থেকে কি হয়ে গেল হাবুলকাকা। যাদের ভাবলাম ভয়ংকর মানুষ তারা হয়ে গেল ভাল। আর একটা রোগা প্যাটকা লোক হয়ে গেল ভয়ানক একজন মানুষ।

হাবুলকাকা হাসলেন, বললেন, মুখ দেখে কি আর সব বোঝা যায়। মানুষের কাজেই তার পরিচয়। তোদের মুখে সব শুনে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাই আমি একা সকালে পাহাড়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বললাম। ওরাও বলল, কাল সন্ধ্যায় ওরা সাদা কাপড় ঢাকা একটা লোককে মন্দিরের পেছনে দেখে তাড়া করেছিল। তারপর তোদের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায়। তখন সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম, আজ তোদের নিয়ে পাহারা দেব। তোরা চিনিয়ে দিলে ওকে অনুসরণ করে ওকে পাকড়াবো। তোরা ঠিক ঠিক সব করেছিস তাই ওই ভয়ংকর চোরকে এত সহজে ধরা গেল। তোরা যা চাইবি তাই পাবি প্রাইজ হিসেবে।

সুমন তাড়াতাড়ি বলল, আমার মত একটা রিভলবার কিনে দেবেন হাবুলকাকা! তাই দিয়ে আমি এইরকম সব দুষ্টু লোকেদের আপনার মতো করে শায়েস্তা করে দেব।

হাবুলকাকা হো হো করে হাসলেন। তারপর বললেন, এখন না। বড় হও। তোকে কথা দিলাম, এই রিভলবারটাই আমি তোকে দিয়ে দেব।

বাড়িতে ফিরে বিল্টু আর সুমন উত্তেজনায় টগবগ করছিল। চৌকাঠে পা দিয়ে সুমন চেঁচিয়ে ডাকল, কাকিমা, ও কাকিমা তাড়াতাড়ি শুনবে এসো। দারুন সব কান্ডমান্ড ঘটে গেছে।

কাকিমা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন। হাবুলকাকা তখন নিচু হয়ে পায়ের জুতো মোজা খুলছেন। হাবুল-কাকিমা বললেন, বাপরে, চিৎকার শুনে আমিতো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, তোমাদের ডোঙ্গরগড় পাহাড়ের ডাকাত আমাদের বাড়িতে এসে হানা দিয়েছে। একটু থেমে বললেন, বল কি ব্যাপার!

সুমন বলল, হাবুলকাকা আপনি বলুন।

হাবুলকাকা বললেন, না, আজকে তোমরাই বলবে। পুরো ঘটনাটা তোমাদের জন্যই ঘটা সম্ভব হয়েছে।

সুমন লজ্জা পেয়ে বলল, না, না হাবুলকাকা আপনি না থাকলে কোন কিছুই হোতনা। আমিতো যাদের খারাপ ভেবেছিলাম তারাই ভাল হয়ে গেল।

হাবুলকাকিমা বললেন, আচ্ছা আচ্ছা তুমিই বল। ওদের যখন বলতে এত কিন্তু কিন্তু তখন তুমিই বল, কি হল।

হাবুলকাকা বললেন, চোর ধরা পড়েছে। বিগ্রহের

গলার হারও পাওয়া গেছে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে শ্রীমান বিল্টু আর সুমনের জন্য।

কাকিমা বলে উঠলেন, বল কি? এতদিন ধরে এত কথা শুনে আসছিলাম ডোঙ্গরগড়ের পাহাড়ের মন্দির নিয়ে। কেউ বলে রাতে ভূত আসে, কেউ বলে নিশাচরেরা নানা কুকাজ সেখানে করে—শেষমেস কিনা ধরা পড়ল একটা জ্যান্ত চোর।

সুমন বলল, আমি কিন্তু আরো আগে ধরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু বিল্টুটা এত ভীতু না! যা-ই বলি ওর সব কিছুতেই খালি না না।

হাবুলকাকা হাসলেন। বললেন, না হে সুমন। অতটা উদ্যোগী না হয়ে তুমি ভালই করেছো। আর বিল্টুবাবু ভুল কিছু করেনি। শত্রু কতটা শক্তিমান তা আগে জেনে বুঝে নিতে হয়। তা না বুঝে নিতে পারলে তুমি লড়াইটা করবে কি করে!

সুমন বলল, বারে, আমিতো দেখেইছিলাম যে একটা মাত্র রোগাপ্যাঁচকা লোক রোজ পাহাড় থেকে নামে—সুমন কথা বলতে বলতে হঠাৎ—বাবারে বলে চিৎকার করে উঠল।

হাবুলকাকা অবাক হয়ে বললেন, কি হল?

হাবুলকাকিমা মুচকি হেসে বললেন, ও কিছু নয়। বিল্টুবাবুর হাত-পিঁপড়ে কামড় দিয়েছে বোধহয় সুমনকে।

হাবুলকাকা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তাহলে বিল্টুবাবুর সাহস বেড়েছে বল।

সুমন ফুঁসে উঠল। ওর সাহসের কথা আর বলবেন

না। একটার ভীতুর ডিম। সারাক্ষণ খালি সাপের ভয়। সন্ধ্যে হলেই লতা লতা লতা শুরু করবে।

হাবুলকাকা অবাক হয়ে বললেন, লতাটা আবার কি জিনিস!

বিল্টু বলল, মা বলে দিয়েছেন—রাত্রি বেলা সাপের নাম করলে সাপেরা খুব রেগে যায়। ওদের নাম না করে লতা লতা বলতে হয়। তাহলে ওরা কাছে আসবেনা।

হাবুলকাকিমা হো হো করে হেঁসে উঠলেন। বললেন, ঈশ কাল তোমার থিয়োরিটা জানা থাকলে আমার খুব উপকার হত। কাল ভোরে পিছনের দিকের বারান্দায় দেখি এতবড় সাপের একটা খোলস। তার আগের দিন যদি আমি তিনবার লতা লতা লতা বলতাম তাহলে নিশ্চয় সাপ এখানে এসে খোলস ফেলতোনা।

হাবুলকাকা বললেন, তা নয়। বিল্টুবাবু তার মায়ের কথা শুনে মনে সাহস পাচ্ছে। ওর মনে বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাস জিনিসটা খুব ভাল। আসলে ওর মা বোঝাতে চেয়েছেন—সন্ধ্যে হলে সাপের ধারে কাছে যেওনা।

সুমন বলল, শুধু কি তাই নাকি! সন্ধ্যে হলেই বাড়ি চল বাড়ি চল বলে অস্থির করে দেয়। খারাপ চেহারায় কাউকে দেখলেই হাউমাউ করে জড়িয়ে ধরে। কাকিমা, ওকে ভাত নয়, দুধ খাওয়ান।

হাবুলকাকিমা হেসে বিল্টুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, আমাদের বিল্টুবাবু খুব ভাল ছেলে।

ও ঝামেলা ঝঞ্জাট পছন্দ করেনা বলেই এমন করেছে। তাই না বিল্টু ?

বিল্টু ঘাড় একদিকে কাত করে হাবুলকাকিমার কথায় সায় দিল। তারপর ফিক করে হেসে বলল, যত কথাই হোক না কেন—এত বড় ব্যাপারে আমিও ছিলাম—ডোঙ্গরগড়ের এই চোর ধরাতে আমারও হাত ছিল—এ কথাটাতো সবাইকে মানতে হবে।

হাবুলকাকা বিল্টুর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন।তারপর বললেন, একশোবার স্বীকার করতে হবে যে, বিল্টুবাবুকে বাদ দিয়ে এতবড় ঘটনাটা কিছুতেই ঘটতে পারত না।কেননা, এখানে আসার জন্য জেদ ধরেছিল বিল্টুই। আর ওরা এখানে না এলে এত সব কান্ডমান্ড ঘটতে পারতোনা।

শেষ